بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ মোতাবেক ২৮ তবলীগ, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ কেমন ছিল, এ সম্পর্কে খায়বারের যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ করা হচ্ছিল। খায়বারের যুদ্ধের পর ইহুদীদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-কে হত্যার একটি ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল এবং তাঁকে বিষমেশানো ছাগলের মাংস খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। এর বিশদ বিবরণ হলো, খায়বার জয়ের পর যখন খায়বারবাসীদের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়, যার ভিত্তিতে চরমভাবে পরাজিত হওয়ার পরও পুনরায় মহানবী (সা.)-এর করুণা ও দয়ায় তারা (ইহুদীরা) এমনভাব উপকৃত হয় যে, মহানবী (সা.) তাদেরকে শুধু ক্ষমাই করেন নি বরং খায়বারে বসবাসেরও অনুমতি প্রদান করেন। লোকেরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেলে, একদিন খায়বারের সৈন্যদলের সেনাপতি সালাম বিন মিশকামের স্ত্রী **যয়নব বিনতে হারেস** মহানবী (সা.)-এর সমীপে ছাগলের ভুনা মাংস পেশ করে আর বলে, আপনার জন্য উপহার নিয়ে এসেছি। কোনো কোনো স্থানে এটিও পাওয়া যায়, (এই) ষড়যন্ত্রে শুধু এই মহিলা একাই জড়িত ছিল না, বরং কতিপয় অন্য ইহুদীরাও জড়িত ছিল। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে সেই উপহার এনে তাঁর সামনে রাখা হয়। সেখানে কয়েকজন সাহাবীও উপস্থিত ছিলেন, যাদের মধ্যে হযরত বিশর বিন বারাআ (রা.)ও ছিলেন। মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে বলেন, কাছে আসো। এরপর তিনি (সা.) হাত বাড়িয়ে সেখান থেকে রানের মাংস তুলেন এবং সেখান থেকে ছোট্ট একটি টুকরো নেন। অন্যরাও নেন। (এরপর) মহানবী (সা.) বলেন, থামো, কেননা এই রানের মাংস বলছে যে, এটি বিষাক্ত। হযরত বিশর বিন বারাআ (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন, সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে এই মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন, আমি যে লোকমাটি খেয়েছি তাতে আমি কিছু অনুভব করেছিলাম, কিন্তু আমি শুধু এ কারণে তা ফেলে দিইনি, যাতে আপনার খাবারের রুচি নষ্ট না হয়। কিন্তু এরপর যখন আপনি লোকমাটি ফেলে দেন, তখন আমার নিজের চেয়ে আপনার চিন্তা বেশি হয় এবং আমি আনন্দিত হই যে, আপনি তা (মাংস) গিলে ফেলেননি। হযরত বিশর (রা.) তখনো নিজের স্থান থেকে উঠেন নি (এর আগেই) তার শরীরের রং পরিবর্তন হতে শুরু করে এবং তিনি এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েন যে, নিজের থেকে পাশও ফিরতে পারতেন না। এমনকি প্রায় এক বছর পর তিনি মারা যান। যদিও কেউ কেউ বলেছেন, হযরত বিশর বিন বারাআ (রা.) তার জায়গা থেকে ওঠার আগেই মারা গিয়েছিলেন। দু'ধরনের রেওয়ায়েত রয়েছে। মহানবী (সা.) সেই মহিলাকে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি এই ছাগলের (মাংসে) বিষ মিশিয়েছ? সে বলে, আপনাকে কে এই সংবাদ দিয়েছে? তিনি (সা.) বলেন, আমার হাতের এই রানের মাংস আমাকে অবহিত করেছে। সে বলে, হ্যাঁ, আমি বিষ মিশিয়েছি। তিনি (সা.) বলেন, তোমাকে কে এই কাজ করতে বলেছে? সে বলে, **'আপনি আমার জাতির সাথে যা করেছেন তা আপনার অজানা নয়। আমি ভেবেছিলাম, যদি আপনি বাদশাহ্ হন তাহলে আমরা আপনার হাত থেকে মুক্তি**

লাভ করবো আর যদি আপনি নবী হন, তাহলে আপনাকে (এ বিষয়ে) সংবাদ দেয়া হবে।' মহানবী (সা.) সেই মহিলাকে উপেক্ষা করেন তথা ক্ষমা করে দেন। তিনি (সা.) সেই মহিলার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিশোধ নেন নি। অন্য আরেক রেওয়ায়েতে আছে, মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাকে এই কাজ করতে কে প্ররোচিত করেছে? সে বলে, **আপনি আমার পিতা, চাচা, স্বামী ও ভাইকে হত্যা করেছেন**। আরেক রেওয়ায়েত অনুসারে, হযরত বিশর বিন বারাআ (রা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন মহানবী (সা.) সেই মহিলাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন, এরপর তাকে হত্যা করা হয়। এটিও একটি ভাষ্য।

সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েত হলো, সেই মহিলাকে হত্যা করা হয়নি। যেমন, হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, এক ইহুদী নারী মহানবী (সা.)-এর কাছে বিষমেশানো (রান্না করা) ছাগলের মাংস নিয়ে আসে, তিনি (সা.) সেখান থেকে কিছুটা খান, এরপর সেই মহিলাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি (সা.) এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করেন। সেই মহিলা বলে, **আপনাকে হত্যা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য**। তিনি (সা.) বলেন, **এটি হতে পারে না যে, আমার বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তোমাকে এমনটি করার শক্তি দিবেন**। রাবী বা বর্ণনাকারী বলেন, তখন লোকেরা বলে, আমরা কি এই মহিলাকে হত্যা করবো না যে এ ধরনের সংকল্প করেছে? তিনি (সা.) বলেন 'না'। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর গলায় এর প্রভাব অনুভব করতাম।

আল্লামা নব্বী সহীহ্ মুসলিমের শরাহ্ বা ভাষ্যে লিখেছেন, হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) তাকে হত্যা করিয়েছিলেন আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) সেই নারীকে হযরত বিশর (রা.)'র উত্তরাধীদের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন, যারা তাকে হত্যা করে। হাদীস বিশারদগণ এ বিষয়ে একমত যে, মহানবী (সা.) তাকে হত্যা করিয়েছিলেন। কাযী আইয়ায এর মতে, হত্যা করা এবং না করা সম্পর্কিত রেওয়ায়েতগুলোর মাঝে এভাবে সামঞ্জস্যবিধান করা পেতে পারে যে, মহানবী (সা.) প্রথমে তাকে হত্যা করেন নি কিন্তু হযরত বিশর (রা.) যখন মারা যান তখন মহানবী (সা.) সেই মহিলাকে হযরত বিশর (রা.)-র উত্তরাধিকারীদের কাছে সোপর্দ করেন, যারা (হযরত বিশরের) কিসাস তথা হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ তাকে হত্যা করেন। তবে, সমূহ সম্ভাবনা এটিই যে, সেই মহিলাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল। যেমনটি মুসলিমের হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র অভিমতও এটিই ছিল।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন 'এক ইহুদী নারী সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করে, মহানবী (রা.) প্রাণীর কোন্ অংশের মাংস বেশি পছন্দ করেন? সাহাবীরা বলেন, মহানবী (সা.) রানের মাংস বেশি পছন্দ করেন। একথা শুনে সে একটি ছাগল জবাই করে এবং (উত্তপ্ত) পাথরের ওপর তার কাবাব তৈরি করে এরপর সেই মাংসে বিষ মিশিয়ে দেয়। বিশেষকরে সেই রানের মাংসে যা সম্পর্কে তাকে বলা হয়েছিল যে, মহানবী (সা.) এই অংশের মাংস বেশি পছন্দ করেন। সূর্যাস্তের পর মহানবী (সা.) যখন সন্ধ্যার নামায শেষ করে নিজের তাঁবুর দিকে ফেরত আসছিলেন তখন তিনি (সা.) দেখেন তাঁর তাঁবুর কাছে একজন মহিলা বসে আছে। তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, হে ভদ্রমহিলা! তুমি এখানে কেন এসেছো? সেই মহিলা বলে 'হে আবুল কাসেম! আমি আপনার জন্য একটি উপহার নিয়ে এসেছি'। মহানবী (সা.) তাঁর সঙ্গের কোনো এক সাহাবীকে বলেন, এই (মহিলা) যা দেয় তা নিয়ে নাও। এরপর তিনি (সা.) যখন আহারের জন্য বসেন তখন খাবারের সাথে সেই ভুনা মাংসও দেওয়া হয়। মহানবী (সা.) সেই মাংস থেকে এক লোকমা খান এবং তাঁর

একজন সাহাবী, বশীর বিন আল্ বারাআ বিন আল্ মা'রূরও (এক) লোকমা খান। (সাহাবীর নামটি এখানে মনে হচ্ছে বশীর এর স্থলে বিশর হওয়া উচিত।) ইতোমধ্যে অন্যান্য সাহাবীরাও মাংস খাওয়ার জন্য হাত বাড়ালে মহানবী (সা.) বলেন 'খেওনা, কেননা এই রান আমাকে সংবাদ দিয়েছে যে, মাংসে বিষ মেশানো আছে। এর অর্থ এটি নয় যে, এ সম্পর্কে তাঁর প্রতি কোনো এলহাম হয়েছিল; বরং এটি আরবের একটি প্রবাদ! যার অর্থ হচ্ছে, এই মাংসের স্বাদ নিয়েই আমি বুঝেছি যে, এতে বিষ মেশানো আছে। যেমন, পবিত্র কুরআনে হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে একটি প্রাচীর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, সেটি ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, যার অর্থ কেবল এটিই যে, তাতে ধসে পড়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল।

সুতরাং এখানেও বলার উদ্দেশ্য এটি নয় যে, তিনি বলেছেন, সেই হাত কথা বলেছে, বরং এর অর্থ হলো এই যে, সেটির মাংস চেখে দেখার পর আমি এটি জানতে পেরেছি। অতএব পরবর্তী বাক্য এই অর্থকে সুস্পষ্ট করে দেয়। এতে বিশর বলেন, যে খোদা আপনাকে সম্মান দিয়েছেন, তাঁর কসম খেয়ে আমি বলছি যে, আমিও এই লোকমায় বিষ অনুভব করেছি। আমার মন চাইছিল যে, আমি এটি ফেলে দিই। কিন্তু আমি ভাবলাম, যদি আমি এমনটি করি তাহলে হয়ত আপনার কাছে এটি অপছন্দনীয় হবে এবং আপনার খাবার নষ্ট হবে। আর যখন আপনি সেই লোকমা গিলে নেন, তখন আমিও আপনার অনুসরণে তা গিলে ফেললাম। যদিও আমার মন বলছিল, যেহেতু আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, এতে বিষ আছে, তাই হায়, মহানবী (সা.) যেন এই লোকমা না গিলেন! হযরত মুসলেহ্ মওউদ গিলে ফেলার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অন্যান্য বর্ণনায় এটি রয়েছে যে, তিনি তা গিলেন নি, বের করে দিয়েছিলেন। যাহোক, এরপর তিনি বলেন যে, কিছুক্ষণ পরে বিশরের শরীর খারাপ হয়ে যায় এবং কিছু বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তিনি সেখানে খায়বারেই মৃত্যু বরণ করেন এবং অপর কতক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তিনি এর পর কিছু সময় অসুস্থ ছিলেন এবং পরবর্তীতে মৃত্যু বরণ করেন। এতে মহানবী (সা.) সেটির কিছু মাংস একটি কুকুরের সামনে রাখতে বলেন, যা খেয়ে সেটি মারা যায়। তখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) সেই মহিলাকে ডাকেন এবং বলেন, তুমি এই ছাগলে বিষ মিশিয়েছো? সে বলল, আপনাকে একথা কে বলেছে? তাঁর (সা.) হাতে তখন ছাগলের সামনের পায়ের অংশ ছিল। তিনি বলেন, এই মাংস খণ্ড আমাকে বলেছে। এতে সেই মহিলা বুঝতে পারে যে, তাঁর কাছে এই রহস্য প্রকাশ পেয়ে গেছে এবং সে স্বীকার করে নেয় যে, সে বিষ মিশিয়েছে। তখন তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই অপছন্দনীয় কাজ করতে তোমাকে কীসে প্ররোচিত করেছে? সে উত্তরে বলে, আমার গোত্রের সাথে আপনার যুদ্ধ হয়েছে এবং আমার আত্মীয়রা এই যুদ্ধে মারা গিয়েছে। আমার মনে এই চিন্তা আসে যে, আমি তাকে বিষ খাইয়ে দেবো। যদি তাঁর কার্যকলাপ মানবিক হয়, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর কর্মকাণ্ড যদি মানবিক কর্মকাণ্ড হয়, তাহলে আমরা তাঁর হাত থেকে মুক্তি লাভ করব। আর যদি তিনি সত্যিই নবী হন, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তাকে বাঁচিয়ে নেবেন। মহানবী (সা.) তার এই কথা শুনে তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তার শাস্তি, যা নিশ্চিতভাবে মৃত্যুদণ্ড ছিল, তা দেননি। এটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর মত।

এটাও বলা হয় যে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু এই বিষের কারণেই হয়েছিল। এটা কি সত্য?–(এ সম্পর্কে) সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) মৃত্যুশয্যায় বলতেন যে, হে আয়েশা! খায়বারে আমি যে খাবার খেয়েছিলাম তার কষ্ট আমি সর্বদা অনুভব করেছি এবং এখনও আমি সেই বিষের কারণে আমার শিরাগুলিতে কেটে

যাওয়ার মতো কষ্ট অনুভব করছি। এই হাদিসের ভিত্তিতে কিছু মুসলিম তফসিরকারক এবং হাদিস বিশারদরা বলেছেন যে, তাঁর (সা.) মৃত্যু যেন খায়বারে খাওয়া সেই বিষাক্ত মাংসের কারণেই হয়েছিল এবং এই মৃত্যুকে এই কারণে শাহাদাত বলে অভিহিত করা হয় আর বলা হয় যে, মহানবী (সা.) শহীদে আযম (মহান শহীদ) ছিলেন। অথচ তাঁর (সা.) জন্য এই কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন ছিল না। নবী তো এমন মর্যাদা ও স্তরের অধিকারী হয়ে থাকেন যে, তিনি শহীদও হন, সিদ্দিকও হন, বরং যদি গভীর দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলে এমন কথা বলা শত্রুকে ঠাট্টার সুযোগ দেওয়ার সমতুল্য। ইহুদিরা তো এই কারণে বিষ দিয়েছিল যে, যদি তিনি আল্লাহ্‌র সত্য নবী হন, তাহলে এই বিষ থেকে বেঁচে যাবেন এবং তাঁর (সা.) বেঁচে যাওয়ার কারণে তারা জেনে গিয়েছিল যে, তিনি সত্যিই আল্লাহ্‌র সত্য নবী এবং তাদের দৃষ্টিতে এটি একটি মুজিযা (অলৌকিক ঘটনা) হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু কিছু সরল মানুষ আছে যারা এই বিষের কারণে তাঁর (সা.) মৃত্যু হওয়ার বিষয়টিকে মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। মূল বিষয় হলো এই যে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু কখনোই, কখনোই এই বিষের কারণে হয়নি। এটি তো শুধু একটি কষ্টের প্রকাশ ছিল এবং প্রত্যেকেই জানে যে, কখনো কখনো কোনো শারীরিক কষ্ট বা ক্ষত বা রোগ কোনো বিশেষ সময়ে বা বিশেষ মৌসুমে কোনো কারণে লক্ষণ প্রকাশ করে। যদি এর বিস্তারিত বিবরণে যাই, তাহলে এটাও পাওয়া যায় যে, বিষাক্ত এই মাংস তিনি (সা.) মুখে দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু গিলেননি এবং মুখে যাওয়ার কারণে তাঁর গলা বা তালুতে ক্ষত হয়ে গিয়েছিল আর মাঝে মাঝে খাওয়ার সময় তিনি এতে কষ্ট অনুভব করতেন এবং সেই কষ্টের প্রকাশই তিনি (সা.) অন্তিম অসুস্থতায় করে থাকবেন।

খায়বারের যুদ্ধের প্রেক্ষিতে হযরত সাফিয়ার সাথে বিবাহের উল্লেখও পাওয়া যায়। এর বিস্তারিত বর্ণনায় লেখা আছে যে, খায়বারের নাযার দুর্গ যখন বিজয় করা হয়, তখন সেখানে অনেক বন্দিও গ্রহণ করা হয়েছিল। এই বন্দিদের মধ্যে হযরত সাফিয়া ও তার চাচাতো বোন এবং অন্য নারীরাও ছিলেন। কিছু গ্রন্থে নাযার-এর স্থলে কামুস দুর্গের নাম পাওয়া যায়। হযরত সাফিয়া হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) কাতিবার দুর্গে পৌঁছার পূর্বেই নাযার দুর্গে তাকে বন্দি করেছিলেন। কিনানা-র মতে, নাযার দুর্গ বেশি শক্তিশালী ছিল, তাই তারা নারী ও শিশুদের নাযার দুর্গে স্থানান্তরিত করেছিল।

হযরত সাফিয়া-র মহানবী (সা.)-এর ভাগে আসা এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে তার বিবাহের বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, খায়বারে যখন বন্দিদের একত্রিত করা হয়, তখন হযরত দাহিয়া আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে এই বন্দিদের মধ্য থেকে একটি মেয়ে দিন। তিনি (সা.) বলেন, যাও, একটি মেয়ে নিয়ে নাও। তিনি হুয়াই বিন আখতাব-এর মেয়ে সাফিয়াকে নিয়ে নেন। তখন এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি দাহিয়াকে হুয়াই-এর মেয়েকে দিয়ে দিয়েছেন, যে বনু কুরাইযা এবং বনু নাজীর-এর রাজকুমারী। আপনি ছাড়া সে অন্য কারো জন্য উপযুক্ত নয়। তিনি (সা.) বলেন, তাকে তার সাথে ডেকে আনো। সে তাকে নিয়ে আসে। যখন মহানবী (সা.) তাকে দেখেন, তখন বলেন, এই বন্দিদের মধ্যে একে ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে তুমি গ্রহণ করো। হযরত আনাস বলেন, এরপর মহানবী (সা.) হযরত সাফিয়াকে মুক্ত করে দেন।

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের বর্ণনা অনুযায়ী, মহানবী (সা.) হযরত সাফিয়াকে বলেন, আমি তোমাকে মুক্ত করছি। তুমি চাইলে আমার সাথে বিয়ে করতে পারো, আর

চাইলে তোমার গোত্রের দিকে ফিরে যেতে পারো। তোমার যা ইচ্ছা। এতে তিনি স্বাধীনতা এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে বিবাহকেই পছন্দ করেন। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি (সা.) তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) যখন হযরত দাহিয়াকে বলেন যে, অন্য কোনো দাসী নিয়ে যাও, তখন এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি (সা.) তাকে হযরত সাফিয়ার চাচাতো বোন বা কিনানা বিন রাবি-র বোনকে প্রদান করেন। কতক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি (সা.) হযরত দাহিয়াকে সাতটি দাস বা দাসী প্রদান করেন এবং হযরত সাফিয়াকে হযরত উম্মে সালমার কাছে পাঠিয়ে দেন। খায়বারের সকল বিষয় সমাধা করার পর মহানবী (সা.) খায়বার থেকে রওয়ানা হন এবং প্রায় ছয় মাইল দূরে তিনি (সা.) থামতে চাইলেন যাতে হযরত সাফিয়ার সাথে বিবাহ সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু হযরত সাফিয়ার ইচ্ছায় তিনি (সা.) যাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং খায়বার থেকে প্রায় বারো মাইল দূরে সাহবা নামক স্থানে থামেন। হযরত উম্মে সুলায়েম কনেকে প্রস্তুত করেন। মহানবী (সা.) হযরত সাফিয়াকে জিজ্ঞেস করেন যে, প্রথম স্থানে থামতে কেন বাধা দিয়েছিলে। এর উত্তর থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর উত্তম আচরণ হযরত সাফিয়ার মনকে কতটা পরিষ্কার করে দিয়েছিল। ইহুদি সরদারের কন্যা এবং এক ইহুদি সরদারের স্ত্রী, যার পিতা মুসলমানদের হাতে খন্দকের যুদ্ধের পর নিহত হয়েছিল তার স্বামী কিছুদিন পূর্বে নিহত হয়েছিল আর স্বামীও সে যার সাথে মাত্র দুই মাস পূর্বে বিবাহ হয়েছিল; যার চাচাও নিহত হয়েছিল এবং আরো নিকটাত্মীয় নিহত হয়েছিল। সে স্বয়ং বর্ণনা করে, আমার হৃদয়ে তাঁর (সা.)-এর বিষয়ে তীব্র ঘৃণা ছিল। কিন্তু প্রথমবার যখন রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয় তখন খুব ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে তিনি (সা.) আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। আর বারংবার আমার কাছে অপারগতা প্রকাশ করছিলেন, হে সাফিয়া! তোমার পিতা সমগ্র আরবকে আমাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত করে নিয়ে এসেছিল এবং সে এটাও করেছে, সেটাও করেছে; পরিশেষে আমাদেরকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে খায়বার আসতে হয়েছে যেন তার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারি। হযরত সাফিয়া বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এত বিপুল পরিমাণে ও এত ভালোবাসার সাথে এই কথাগুলো বারবার বর্ণনা করছিলেন যে, আমার মন তাঁর (সা.) ব্যাপারে একেবারে পরিস্কার হয়ে গেলো। আর প্রথম বৈঠক থেকে উঠার সময়েই মহানবী (সা.) আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন। খায়বার থেকে ফেরত আসার সফর যখন আরম্ভ হয় তখন তার সাথে মহানবী (সা.)-এর উত্তম আচরণের দৃষ্টান্ত এমন ছিল, যখন সফরের জন্য রওনা হওয়ার সময় হয়, তখন তিনি (সা.) বাহনের ওপর তার বসার জন্য নিজের চাদর ভাঁজ করে বিছিয়ে দেন। এরপর নিজের হাঁটু মাটিতে রাখেন, হযরত সাফিয়া (রা.)-এর ওপর নিজের পা রেখে উটে আরোহণ করেন। পথিমধ্যে যখন হযরত সাফিয়ার (রা.) তন্দ্রা আসতো এবং মাথা উটের গদিতে (হাওদা) আঘাত লাগার উপক্রম হলে নিজের পবিত্র হাত দ্বারা সাফিয়ার মাথার পিছনে হাত রাখতেন যেন আঘাত না লাগে আর বলতেন, ব্যথা যেন না লাগে। কেননা হযরত সাফিয়া (রা.) মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিনীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এজন্য খায়বার থেকে ফেরত আসার সময় রসূলুল্লাহ (সা.) তাকে উটে নিজের পিছনে আরোহণ করিয়েছিলেন। আর পর্দার জন্য নিজ চাদর তার ওপর দিয়ে দিয়েছিলেন যেন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি তাঁর (সা.) দাসী নন বরং তাঁর সহধর্মিনী।

ছয় মাইল দূরত্বে না থামার যে উত্তর তিনি দিয়েছিলেন তার বিস্তারিত এভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর (সা.) উন্নত চারিত্রিক আদর্শের প্রভাবের কারণে হযরত সাফিয়ার (রা.) কাছে

জগতে তাঁর (সা.) চেয়ে বেশি প্রিয় আর কেউ ছিল না। সাফিয়া (রা.) তাঁকে উত্তর দিলেন, আপনি যখন (সা.) খায়বারের খুব নিকটবর্তী স্থানে শিবির স্থাপন করতে চাচ্ছিলেন তখন আমি আমার জাতি সম্পর্কে ভয় পাচ্ছিলাম, পাছে তারা আবার আপনার কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করে। এজন্য আমি চাচ্ছিলাম যে, আপনি খায়বার থেকে বেশ কিছুটা দূরত্বে বিরতি দিন।

ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ও তাদের ভয়ানক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাহাবাগণ সতর্ক ছিলেন এবং খায়বারের যয়নব নামের মহিলার খাবারে বিষ মিশিয়ে তাঁকে (সা.) হত্যা করার ষড়যন্ত্রের মাত্র কয়েক দিন অতিবাহিত হয়েছিল। এজন্য তাঁর (সা.) নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীরা এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর (সা.) ব্যাপারে অসতর্ক থাকতে চাচ্ছিলেন না।

এখানে আবু আইয়্যুব (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তিনি (রা.) রাতে পাহারা দিয়েছিলেন এবং তার নিষ্পাপ ও গভীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ যা এই বিবাহের সময় দেখা গেছে। সেটা এমন যে, রাত অতিবাহিত হওয়ার পর যখন মহানবী (সা.) ভোরবেলা নিজ তাঁবু থেকে বের হলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন হযরত আইয়্যুব আনসারী (রা.) তরবারি হাতে তাঁবুর বাহিরে সতর্কাবস্থায় দন্ডায়মান রয়েছেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, কী বিষয়? তিনি (রা.) নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার এই ইহুদী থেকে সদ্য মুসলমান হওয়া মহিলার ব্যাপারে আশংকা ছিল, অর্থাৎ হযরত সাফিয়া (রা.)। তার পিতা এবং স্বামী এবং তার জাতির লোকেরা নিহত হয়েছে আর সে মাত্র নতুন মুসলমান হয়েছে, পাছে আপনার কোন ক্ষতি করে বসে। এজন্য আমি সারারাত তরবারি নিয়ে বাহিরে পাহারা দিয়েছি। হযরত আইয়্যুব (রা.)-এর নিষ্পাপ ভালোবাসার উত্তরে মহানবী (সা.) তাকে দোয়া দিতে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহ! আবু আইয়্যুবের নিরাপত্তা দাও যেভাবে সে আমার নিরাপত্তা দিতে রাত অতিবাহিত করেছে। তার (প্রকৃত) নাম ছিল নাম খালেদ বিন যায়েদ । ইনিই সেই সাহাবী মদীনা হিজরতের করে আগমনের পর মহানবী (সা.)কে কয়েক মাস পর্যন্ত আতিথেয়তা করার সৌভাগ্য যার লাভ হয়েছিল। পঞ্চাশ হিজরীতে এক অভিযানের সময় তিনি মৃত্যুবরণ করেন আর ইস্তাম্বুলে তার কবর আছে। যাহোক, পরবর্তী দিন মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে ওলীমার দাওয়াতের আয়োজন করা হয়। এই ওলীমার দাওয়াত গাম্ভীর্যপূর্ণ ও অনাড়ম্বর ছিল। খেজুর, পনির ও ঘি দিয়ে তৈরী 'হেয়স' ছিল যা সবার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। তিন দিন অবস্থানের পর তিনি (সা.) সেখান থেকে যাত্রা করেন। সাফিয়া (রা.)-কে স্বাধীন করে দেওয়াই তার মোহরানা ধার্য হয়।

হযরত সাফিয়ার (রা.) স্বপ্নেরও বর্ণনা পাওয়া যায় যার সত্যতাও এই বিবাহের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। রেওয়ায়েতে আছে, মহানবী (সা.) হযরত সাফিয়ার (রা.) চোখের কাছে নীল দাগ দেখে জিজ্ঞাসা করেন, এই আঘাতের চিহ্ন কী কারণে হয়েছে? তিনি (রা.) বলেন, আপনার খায়বারে আগমনের কিছু দিন পূর্বে অথবা কতক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, খায়বার অবরোধের দিনগুলোতে আমি একটি স্বপ্ন দেখি– ইয়াসরেব থেকে চাঁদ এসে আমার ঝুলিতে পড়েছে। আমি এই স্বপ্ন আমার স্বামী কেনানার কাছে উল্লেখ করলে তিনি আমার চেহারায় জোরে একটি চড় মেরে (বলেন), তুমি ইয়াসরেবের সেই বাদশাহ [অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)]-কে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখছ? কতক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই স্বপ্ন বহু পুরানো ছিল আর তার (রা.) পিতা হুয়াই তাকে চড় মেরে ছিল। তবে অধিকাংশ পুস্তকে এটিই লেখা রয়েছে যে, তার (রা.) স্বামী তাকে চড় মেরেছিল আর এটিই অধিক সঠিক বলে মনে হয়।

হযরত সাফিয়ার (রা.) নাম যয়নব ছিল কিন্তু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের পূর্বে তিনি (সা.) তাকে গ্রহণ করে স্বাধীন করে দিয়েছিলেন। সেই যুগের রীতি অনুযায়ী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের পূর্বে যে সম্পদ সর্দারের জন্য নির্ধারিত থাকত তাকে সাফিয়া বা আসসাফা বলা হতো। এই সাদৃশ্যের কারণে তার (রা.) নাম সাফিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। হযরত সাফিয়া (রা.) পঞ্চাশ হিজরী সনে হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে মৃত্যুবরণ করেন আর জান্নাতুল বাকী'তে তাকে দাফন করা হয়।

হযরত সাফিয়ার (রা.) বিয়ে নিয়েও প্রাচ্যবিদেরা সমালোচনা করে থাকে এবং নিজেদের অভ্যাস অনুযায়ী হযরত সাফিয়ার (রা.) বিয়ে সম্পর্কে কিছু আপত্তি করে থাকে যা তাদের নিজেদের অজ্ঞতা এবং বিদ্বেষের প্রমাণ বহন করে। উদাহরণস্বরূপ, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নব্বইতম সংস্করণে Muhammadanism (শব্দের) অধীনে লিখা আছে, যার অনুবাদ হলো, সেই সফল যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বশেষ কৃতিত্ব ছিল বাদশাহর মেয়ের সাথে মুহাম্মদ (সা.)-এর বিবাহ। সাফিয়ার এমন ব্যক্তির সাথে বিন্দুমাত্র ঘৃণা বোধ হয় নি (এটি প্রাচ্যবিদ লিখছে), যিনি তার পিতা হুয়াই এবং তার স্বামী কিনানাকে হত্যার মূল হোতা ছিলেন। বরং অতি স্বানন্দে তিনি নিজেকে নতুন রঙে রাঙ্গিয়েছেন। তার থেকে অধিক প্রশংসাযোগ্য তো অপর এক ইহুদী নারী যয়নবের কর্মপন্থা ছিল, যে নিজ জাতির হত্যাকারীকে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা করেছিল, আর এই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ জীবন বিসর্জন দিয়েছে। এই প্রয়াস ব্যর্থ হয় কিন্তু বলা হয়, মুহাম্মদ (সা.) নিজের অন্তিম অসুস্থতায়ও সেই বিষের প্রভাব অনুভব করেছিলেন। অর্থাৎ, সাফিয়া (রা.)-এর প্রতি বিষোদ্‌গার করে লিখেছে, তার স্বামী ও পিতা নিহত হয়েছে তার কিছু আত্মাভিমান প্রদর্শন করা ও প্রতিশোধ গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তার স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে মুহাম্মদ (সা.)-কে বিয়ে করেন। এর বিপরীতে অপর ইহুদী নারী যে বিষ প্রয়োগ করেছিল, তার প্রশংসা করে যে, সে অন্ততপক্ষে আত্মাভিমান প্রদর্শন করেছে এবং মহানবী (সা.)-কে হত্যার চেষ্টা করেছে।

এই লেখকদের ইসলাম এবং ইসলামের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতার কোনো সীমা-পরিসীমা নাই। একটু চিন্তা করে দেখে না যে, সামান্য সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি তাদের লেখা থেকে কী ফল বের করতে পারে। বিদ্বেষের বিষ যা তাদের লেখা থেকে আপনা-আপনি প্রকাশিত হতে থাকে। ন্যায়পরায়ণতার সাথে তারা কাজ করে না। খায়বারের ইহুদীদের সাথে মহানবী (সা.)-এর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এরপর তারা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। অতঃপর তাদের সাথে কী আচরণ হওয়া উচিত ছিল? এই যুদ্ধরীতি– তা সেটি সে যুগে হোক অথবা বর্তমান সভ্যযুগেরই হোক না কেন। তাদের সবাইকে যদি হত্যা করা হতো, তবুও সেটি বৈধ ছিল। তাদের বাইবেল অনুযায়ী এবং তৎকালীন রীতিনীতি অনুযায়ীও এসব (তথা তাদেরকে হত্যা) বৈধ ছিল, কিন্তু সে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর মহানবী (সা.) যে ক্ষমা, মার্জনা এবং নম্র ব্যবহার করেন– সে বিষয়ে প্রশংসা করা তো দূরে থাক, কোনো কথাই বলে না । অতঃপর তাদের সন্ধির আবেদন মেনে নিয়ে তাদের সবাইকে দেশান্তর হবার শর্ত তিনি (সা.) গ্রহণ করে তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। এছাড়াও ইহুদীরা যখন এ আবেদন করল যে, আমাদেরকে এখানে থাকতে দেওয়া হোক, আমরা কৃষিকাজ অব্যাহত রাখব আর উদ্‌গত অর্ধেক ফসল আপনার প্রাপ্য হবে। তিনি (সা.) তাদের এ প্রস্তাবও মেনে নেন আর শান্তি ও নিরাপত্তার একটি চুক্তি সাক্ষর করেন, কিন্তু সেই চুক্তিসাক্ষরের কালি শুকানোর আগেই তারা চক্রান্ত করে

একজন মহিলার মাধ্যমে তাঁকে (সা.) বিষপ্রয়োগের চেষ্টা চালায় আর সেই মহিলা নিজের অপরাধও স্বীকার করে নেয়, যেভাবে আমি এখনই বললাম। বর্তমানে সভ্যযুগের সভ্য লোকেরা– যাদেরকে শিক্ষিত বলা হয়, তারা এমন বাজে চক্রান্তকারী মহিলাকে জাতির 'হিরো' হিসাবে উপস্থাপন করছে। আর যে মহিলা সত্য ও সততাকে পেয়ে, মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ পর্যবেক্ষণ করে সত্যকে গ্রহণ করেছিল আর স্বাধীন হতে বাধা থাকা সত্ত্বেও তিনি (সা.) ঘোষণা দেন, তুমি স্বাধীন। কেবল এটিকে প্রাধান্য দেয় যে, সে তাঁর সাথে সঙ্গ দিয়েছিল। এটি নিয়ে সমালোচনা করে থাকে। অর্থাৎ সে সময় ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচারের সকল নীতি ভুলে যায়। অতঃপর একইভাবে আরো কিছু আপত্তিকারী অভিযোগ করে এবং অশ্লীল দৃষ্টিভঙ্গিতে আপত্তি করে থাকে যে, মহানবী (সা.) যখন হযরত সাফিয়া (রা.)-এর সৌন্দর্যের প্রশংসা শোনেন তখন হযরত দাহিয়া-র নিকট থেকে তাকে চেয়ে নেন এবং তিনি (সা.) নিজে তাকে বিয়ে করেন, ইত্যাদি।

প্রকৃত অর্থে এ আপত্তি নিজেদের হীনম্মন্যতার কারণে এ লোকেরা করে থাকে আর দ্বিতীয়ত, মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার জীবনচরিত না বুঝার কারণে এসব সৃষ্টি হয়ে থাকে। এসব মানুষের হৃদয় বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এসব লোকেরা যদি ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে এবং পবিত্র হৃদয় দিয়ে অবগাহন করত, তাহলে এমন ধারণা করত না। মহানবী (সা.)-এর অতীত-জীবনের প্রতি যদি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়, যেদিকে কুরআন করীম-ও অত্যন্ত সুন্দরভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে যে, **ফাকাদ লাবিসতু ফিকুম উমুরাম মিন কাবলিহি আফালা তা'কিলুন**। অর্থাৎ আমি এর পূর্বেও তোমাদের মাঝে এক সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছি, তবুও কি তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না? নবী করীম (সা.) সে জাতির মাঝে নিজের যৌবনকাল কীভাবে অতিবাহিত করেছেন, যেখানে হরহামেশা কেবল মদ-জুয়ার আসরই বসত না, বরং গর্বভরে এসবের উল্লেখ করা হতো। তিনি (সা.) নিজের পুরো যৌবনকাল একজন বিধবা, সম্মানিত ও ভদ্রমহিলার সাথে বিয়ে করে অতিবাহিত করেন আর কমবেশি ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত সেই একজন স্ত্রীর সাথেই জীবন কাটান। একের পর এক সুন্দরী মহিলাদের প্রস্তাব স্বয়ং কুরাইশ নেতারা তাঁকে (সা.) প্রদান করেন– যা ইতিহাস থেকে প্রমাণিত, কিন্তু তিনি (সা.) তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন।

মহানবী (সা.)-এর যৌবনকাল এবং গত হয়ে যাওয়া এসব মাস-বছর এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ যে, তাঁর (সা.)সাথে (নাউযুবিল্লাহ) বিবাহের আমোদফূর্তির দূরতম কোনো সম্পর্কও ছিল না। পরবর্তীতে তিনি (সা.) যে–সব বিয়ে করেছেন তার একটি প্রজ্ঞা ছিল আর তা হলো, বিরোধী জাতি ও গোত্রের মাঝে যেন সন্ধি ও শান্তি এবং ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় আর বিশ্বস্ততার পরিবেশ বজায় থাকে। যেমন- বনূ মুস্তালিকের সর্দার হারেসের কন্যা জাওয়াইরিয়ার সাথে, কুরায়শ-এর আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবার সাথে, একইভাবে খায়বারের বিজয় হবার পর সে গোত্রের সর্দারের স্ত্রী ও কন্যাকে গোলাম ও দাসী হিসাবে সাধারণ ব্যক্তির অধীনস্থ করা হলে তার অপমান ও লাঞ্ছনা করা হতো। মহানবী (সা.)– যিনি আধ্যাত্মিক জগতের বাদশা ছিলেন, মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন, তিনি হযরত সাফিয়াকে প্রথমে স্বাধীন করে তাকে সম্মানে ভূষিত করেন। অতঃপর নিজের পরিবারের কাছে যাবার প্রস্তাব দিয়ে তার মর্যাদা ও সম্মানকে আরো বৃদ্ধি করেছেন। [তিনি (সা.) বলেন,] তুমি তোমার পরিবারের কাছে যেতে পারো। এরপর তাকে বিয়ে করে সেই মর্যাদা প্রদান করেন, যার ফলে তিনি সকল মু'মিনের মা সাব্যস্ত হলেন। এর পাশাপাশি তার

গোত্রসমূহ ও বংশের সম্মান-প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে আর সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

উইলিয়াম মন্টগমেরি ওয়াট একজন স্কটিশ প্রাচ্যবিদ যিনি ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে তার বইতে খুবই কঠোর মন্তব্য করেছে তার একটি বই যার নাম হচ্ছে 'মুহাম্মদ এ্যাট মদীনা'। বিদ্বেষপরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর বিয়ে সম্পর্কে এটি লিখতে বাধ্য হয়েছে যে, ইহুদীদের কন্যা সাফিয়্যা এবং রেহানাকে বিয়ে করার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। [এটি বলে নি যে, রূপসৌন্দর্য দেখে পছন্দ হয়েছে, বরং বলেছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে।] যতদূর এটি অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিয়েসমূহ বা সম্ভাব্য তালিকার নারীদের সাথে স্বীকৃত বিবাহের সাথে সম্পর্ক রাখে, এর মূল উদ্দেশ্য সম্ভবত রাজনৈতিক ছিল। [সে কমপক্ষে এতটুকু স্বীকার করেছে যে, কোনো কুদৃষ্টি ছিল না।]

হযরত সাফিয়া (রা.)-এর বিবাহের প্রেক্ষাপটে বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম ম্যুর-এর আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এভাবে বলেন, মিস্টার ম্যুর আপত্তি করেছে বটে, কিন্তু সে জানত না যে, আরবের প্রথা ছিল– দেশে শান্তিশৃঙ্খলা এবং সে দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য বিজিত দেশ-প্রধানের কন্যা বা স্ত্রীকে বিয়ে করা হতো। সাধারণ জনগণ এবং সম্ভ্রান্ত গোত্রগুলো এ ভেবে প্রশান্ত হতো যে, এখন কোনো ভয় নেই। সুতরাং খায়বার বিজয়ের পর সমস্ত ইহুদীরা সেখানেই থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

হযরত সাফিয়া (রা.)-এর বিবাহের প্রেক্ষাপটে আমাদের জীবনীকার এবং ঐতিহাসিকরাও অসতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং এই ভুল করেছেন যে, যাচাই-বাছাই ছাড়াই তারা সেসব রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন যেগুলোর কোনো মাথামুণ্ডু নেই। উদাহরণস্বরূপ- এই রেওয়ায়েত কমবেশি প্রতিটি ইতিহাস এবং জীবনীগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.) প্রথমে হযরত সাফিয়াকে হযরত দাহিয়ার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু যখন রূপসৌন্দর্যের বর্ণনা শোনেন তখন হযরত সাফিয়াকে ডাকেন এবং নিজের জন্য রেখে দেন। এমন একটি বর্ণনা বুখারী শরীফেও রয়েছে যার উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে, হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, আমরা যখন খায়বারে পৌঁছি এবং আল্লাহ তা'লা যখন দুর্গ বিজয় লাভ করান তখন সাফিয়া বিনতে হুয়ি বিন আখতাব-এর সৌন্দর্যের প্রশংসা মহানবী (সা.)-এর সামনে উল্লেখ করা হয় আর তখনো তিনি নববধু ছিলেন, তার স্বামী মারা গিয়েছিল, অর্থাৎ বিবাহের মাত্র কিছুদিন হয়েছিল। তখন মহানবী (সা.) তাকে নিজের জন্য পছন্দ করেন। এটি সেই বর্ণনা– যা কতিপয় অসুস্থ মস্তিষ্কের লোক তাঁর (সা.) প্রতি আপত্তি করে থাকে।

বিখ্যাত জীবনীকার আল্লামা শিবলী নু'মানি এই উদ্ধৃতির উল্লেখ করতে গিয়ে লেখেন, হযরত সাফিয়া (রা.) সম্পর্কে কোনো কোনো হাদীস গ্রন্থে এই ঘটনার বর্ণনা রয়েছে যে, মহানবী (সা.) প্রথমে তাকে দাহিয়া কালবীকে দিয়েছিলেন। অতঃপর কেউ তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করলে তিনি (সা.) তার কাছ থেকে ফেরত নেন এবং এর বিপরীতে তাকে সাতজন দাসী প্রদান করেন। বিরুদ্ধবাদীরা এই বর্ণনাটিকে অতি নোংরাভাবে উপস্থাপন করেছে অথচ মূল বর্ণনায় মাত্র এতটুকু কথা রয়েছে। ফলে স্পষ্ট যে, বিরোধীরা এটিকে কোথায় নিয়ে যাবে? প্রকৃত বিষয় হলো, হযরত সাফিয়া (রা.)-এর ঘটনা হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে, যা পরস্পর বিরোধী।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আরেকটি রেওয়ায়েত এমনও আছে যে, হযরত সাফিয়া (রা.) যখন দাহিয়ার অংশে এলো তখন লোকেরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে নিবেদন করে যে, সে খায়বারের নেতার একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সম্মানিতা নারী। আপনি (সা.) ছাড়া আর কেউ তার যোগ্য নয়।

অতএব প্রথমত, যদি এমন কোনো বর্ণনা আসলেই সঠিক হয় যেমনটি বুখারীর এই বর্ণনায় এসেছে অর্থাৎ তাঁর সৌন্দর্যের প্রশংসা করা হয়েছিল, তাহলে খুব সম্ভব সাহাবীদের মধ্য থেকে পরবর্তীতে কেউ এই বর্ণনা করে থাকবে আর নিজের পক্ষ থেকে এই শব্দ যুক্ত করে থাকবে। [প্রথম ঘটনা কোনো এক সাহাবী বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে কতিপয় মানুষ বর্ণনায় সংযুক্তি করেছে] কেননা সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর মর্যাদার বিষয়ে এমন কোনো কথা বলতে পারেন না যার মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদার বিষয়ে কোনো ধরনের তীর্যক ইঙ্গিত সৃষ্টি হতে পারে। অথবা সম্ভবত লোকেরা নিজেদের পক্ষ থেকে সাফিয়ার সৌন্দর্যের পাশাপাশি তাঁর অন্যান্য গুণাবলি ও বংশ মর্যাদার কথাও উল্লেখ করে থাকবে আর বর্ণনাকারীর যা স্মরণ ছিল তা সংক্ষেপে বলে দিয়েছে। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় যেদিকে জীবনীকাররা মনোযোগ দেয় না, তা হলো- মহানবী (সা.) যে মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, তার জন্য কারো ব্যক্তিগত এসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি অত্যন্ত নগণ্য ও গৌণ মর্যাদা রাখে। তিনি (সা.) যখন এই বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন বিবাহের মূল কারণ তা ছিল না যা বর্ণনা করা হচ্ছে, বরং মূল কারণ ঐশী আদেশ হয়ে থাকবে। মহানবী (সা.)-এর প্রত্যেকটি চলা ও থামা ঐশী অভিপ্রায় ব্যতিরেকে হতো না। যেভাবে স্বয়ং আল্লাহ বলেন,

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (সূরা আনআম: ১৬৩)

অর্থাৎ তুমি বলে দাও, আমার ইবাদত, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক-প্রভু আল্লাহর জন্য। যিনি সকল কাজ আল্লাহ্‌র জন্য করতেন আর প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্ যাকে পথনির্দেশ দিতেন, তিনি কীভাবে এতো বড়ো সিদ্ধান্ত স্বপ্রণোদিত হয়ে নিতে পারেন? অতএব, তিনি (সা.) এই সকল বিবাহ নিঃসন্দেহে ঐশী আদেশে করেছিলেন। আর এগুলোর ফলাফল নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ ও উদ্দেশ্যপূর্ণ ছিল। হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) তার এক পুস্তক আয়ানায়ে কামালাতে ইসলামে বলেন, "মহানবী (সা.)-এর বিষয়ে সাহাবীদের নিঃসন্দেহে এই বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর কোনো কথা-কাজ ওহীর নির্যাস বহির্ভূত ছিল না তাই সে ওহী সংক্ষিপ্ত হোক বা বিস্তারিত, নিরবে হোক বা প্রকাশ্যে আবার সূক্ষ্ম হোক বা স্পষ্ট, এমনকি ব্যক্তি জীবনেও স্ত্রীদের সাথে মহানবী (সা.)-এর যাবতীয় কথা কাজ বা যতটা খাওয়া-দাওয়া এবং পোশাক-আশাক সম্পর্ক ছিল এবং সামাজিক প্রয়োজনে প্রাত্যহিক জীবনের পারিবারিক বিষয় ছিল, সবগুলো এই চেতনায় হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যে, এই সকল কাজ ও কথা পবিত্র আত্মার নির্দেশনার আলোকে হয়েছিল। অতএব, আবু দাউদ শরীফসহ অন্যান্য গ্রন্থে এই হাদীস বর্ণিত রয়েছে আর ইমাম আহমদও বিভিন্ন সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ (রা.) বলেছেন, আমি যা-কিছু মহানবী (সা.) থেকে শুনতাম তা লিখে নিতাম যেন আমি তা মুখস্থ করতে পারি। অতএব কেউ কেউ আমাকে নিষেধ করল যে, এরূপ করো না কেননা মহানবী (সা.) মানুষ তাই কখনো কখনো রেগেও কথা বলেন। এই কথা শুনে আমি লেখা থেকে বিরত থাকলাম আর পরবর্তীতে মহানবী (সা.)-এর সমীপে বিষয়টি উত্থাপন করলাম। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, জবাবে মহানবী (সা.) বলেন, সেই সত্তার

কসম যার হাতে আমার প্রাণ! আমার দ্বারা যা-ই সম্পাদিত হয় হোক তা কথা বা কাজ তা সবই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। যদি এটা বলা হয় যে, এসব হাদীস গ্রন্থেই কতক বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর ইজতেহাদী ত্রুটিরও (বিশ্লেষণগত ভুল) উল্লেখ আছে তাহলে যদি (তাঁর) সমস্ত কথা ও কাজ ওহীর মাধ্যমে ছিল তাহলে সে সমস্ত ত্রুটি কেন হয়েছে? মনে হচ্ছে যে (নাউযুবিল্লাহ) মহানবী (সা.)-কে এ বিষয়ের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা হয় নি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, এর উত্তর হল: এ সমস্ত ইজতেহাদী ত্রুটিও (বিশ্লেষণগত ভুল) ওহীর মাধ্যমে নিরসন হয় না কেননা মহানবী (সা.) আল্লাহ তা'লার ঐশী ছায়া থেকে কখনও একেবারে পৃথক হতেন না। সুতরাং এই ইজতেহাদী ত্রুটি (বিশ্লেষণগত ভুল)-এর উদাহরণ তেমনই যেমনটি মহানবী (সা.) নামাযে কয়েকবার ভুল করেছিলেন যাতে এ থেকে ধর্মের জন্য নতুন কোন মাসলা সৃষ্টি হয়। সুতরাং এভাবেই কিছু কিছু সময় ইজতেহাদী ত্রুটি (বিশ্লেষণগত ভুল) হয়েছিল যাতে এর মাধ্যমে ধর্ম পরিপূর্ণ হয় আর এর মাধ্যমে কিছু সূক্ষ্ম মাসলা সৃষ্টি হয়। আর এই মানবীয় ত্রুটি অন্যান্য মানুষদের মত ছিল না বরং সেটা প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের ওহী ছিল কেননা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এক বিশেষ অধিকার ছিল যা নবী রসূলের সত্ত্বায় আধিপত্য বিস্তার করে সেটাকেও এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যার মাঝে খোদা তা'লার অনেক প্রজ্ঞা বিদ্যমান থাকে। সুতরাং আমরা এই ইজতেহাদী ত্রুটিকে (বিশ্লেষণগত ভুল) ওহী থেকে পৃথক কোন কিছু মনে করি না কেননা সেটি কোন সাধারণ বিষয় ছিল না। আর তার কারণ হল, আল্লাহ তা'লা সে সময় নিজের নবীকে নিজের করায়ত্তে রেখে সার্বজনীন প্রজ্ঞার জন্য একটি নূরকে মানবীয় ত্রুটির মাধ্যমে অথবা ইজতেহাদী ত্রুটির (বিশ্লেষণগত ভুল) আঙ্গিকে প্রকাশ করে দিতেন। আর এভাবে সাথে সাথেই ওহী নিজের স্বপ্রতাবে প্রকাশিত হওয়া শুরু করে দিত। যেমন একটি বহমান নদীর পানিকে যদি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে আটকিয়ে রেখে তা ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এটা বলতে পারে না যে, নদীর পানি শুকিয়ে গেছে অথবা নদী থেকে তা (পানি) উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। সুতরাং নবীদের ইজতেহাদী ত্রুটির (বিশ্লেষণগত ভুল) বিষয়টি এমনই অর্থাৎ রুহুল কুদুস তো কখনও তাঁর (নবী) থেকে পৃথক হতেন না তবে কখনও কখনও আল্লাহ তা'লা কিছু বিশেষ ঐশী কর্মকাণ্ডের জন্য নবীদের জ্ঞান ও বোধশক্তিকে নিজের করায়ত্বে নিয়ে নেন তখন কোনো কথা বা কাজ মানবীয় ত্রুটি বা ভুলের মাধ্যমে তাদের (নবীদের) দ্বারা সম্পাদন হয়ে থাকে। আর যে প্রজ্ঞা যা পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হয়েছিল– তা প্রকাশিত হয়ে যায় আর তখন ওহীর সমুদ্র তুমুলভাবে ঢেউ তোলা আরম্ভ করে। তখন ভুল-ত্রুটিকে তা থেকে এমনভাবে দূরীভূত করা হয় যে সেই ভুলের কোন অস্তিত্বই ছিল না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হযরত ঈসা (আ.)-এর একটি ডুমুরবৃক্ষের উদাহরণ দেন যে, হযরত ঈসা (আ.) একটি ডুমুরবৃক্ষের দিকে দৌড়ে গিয়ে তার ফল খেয়ে ফেলেন, তখন রুহুল কুদুস তার সাথেই ছিল কিন্তু রুহুল কুদুস অবগত করে নি যে সে সময় ডুমুরবৃক্ষে কোন ফল নাই। তাছাড়াও তখন লোকজন জানত যে ব্যতিক্রম বিষয় শুধু কোন অস্তিত্বহীন জিনিসের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে সুতরাং কখনও কখনও কোন জিনিসের অস্তিত্ব থাকলেও তা না থাকারই নামান্তর। সুতরাং আমাদের নেতা মহানবী (সা.)-এর দশ লাখের মত হাদিস ও কাজের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে খোদা তা'লারই নিদর্শন বলে সাব্যস্ত হয় আর প্রত্যেকটি বিষয়ে, প্রত্যেকটি চলা-ফেরায়, প্রত্যেকটি কথায়, প্রত্যেকটি কাজে রুহুল কুদুসের জাজ্বল্যমান নূর দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং যদি এরূপ সামান্য বিষয়ে মানবীয় ত্রুটির চিহ্নও থাকে তাহলে কীইবা ক্ষতি। বরং আবশ্যক

ছিল যে, মানব হওয়ার প্রমাণস্বরূপ কখনও কখনও এমনটাও ঘটে যাতে মানুষ শিরকের মাঝে লিপ্ত না হয়।

সুতরাং যদি কোন হাদীস, ইতিহাস বা জীবনচরিতের গ্রন্থে মহানবী (সা.)-এর জীবনী সম্পর্কে কোন রেওয়ায়াত বর্ণিত হয় তাহলে উপর্যুক্ত আয়াত যা আমি পাঠ করেছি অর্থাৎ আল্লাহ তা'লার জন্যই তাঁর (সা.) সবকিছু ছিল সেক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপন না করে এবং প্রত্যেক প্রাচ্যবিদদের কথা না মেনে আর এটি না ভেবে যে আমরা উত্তর দিতে অপারগ; উক্ত আয়াতের আলোকে এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনীর ভিত্তিতে এসব বিষয় দেখা উচিত এবং যাচাই বাছাই করা উচিত। অযথা আপত্তি করা উচিত না এবং সকল প্রাচ্যবিদের কথাও বিশ্বাস করা ঠিক না পাছে তারা ভাবে, আমরা নিরুত্তর হয়ে গেছি।

সুতরাং মহানবী (সা.)-এর পবিত্রতা প্রতিষ্ঠা করার প্রকৃত কাজ এটিই। শুধু স্লোগান দিলেই হবে না।

দুইদিন পর রমজান শুরু হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'লা এ থেকে সর্বাধিক কল্যাণ, গ্রহণীয় রোযা এবং দোয়ার তৌফিক দান করুন। এ জন্য দোয়াও করুন আর চেষ্টা-প্রচেষ্টাও করুন।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযাও পড়াবো। রাবওয়ার চৌধুরী মুহাম্মদ আনোয়ার রিয়াজ সাহেবের যিনি মরহুম চৌধুরী মুহাম্মদ আসলাম সাহেবের পুত্র ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম মূসী ছিলেন। তাঁর পুত্র নাসের মাহমুদ তাহের কেনিয়ার আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ। তিনি দেশের বাহিরে থাকার কারণে নিজ পিতার জানাযায় অংশ নিতে পারেন নি। মরহুমের অন্যান্য সন্তানেরা কোনো না কোনোভাবে জামাতের সেবায় নিয়োজিত।

নাসের মাহমুদ সাহেব লিখেন, তার বংশে আহমদীয়াত তাঁর দাদা চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ জাট সাহেবের (রা.)-এর মাধ্যমে এসেছিল। যিনি স্বয়ং কাদিয়ান গিয়ে হযরত মসিহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। তিনি তাঁর গ্রামের প্রথমদিকের বয়আতকারী আহমদীদের একজন ছিলেন। ১৯৯৬ সালে তাঁর পিতা একটি মামলার কারণে প্রায় একমাস খোদার পথে বন্দী থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন। কারাবন্দি থাকা অবস্থায় পুলিশ তাঁর সাথে খুবই খারাপ আচরণ ও অসদাচরণ করে। কিন্তু তিনি কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য এ-সকল নির্যাতন খুবই অবিচলতার সাথে সহ্য করে কারাভোগ করেন।

নেযামে জামা'ত ও খেলাফতের খুবই অনুগত ছিলেন। নামায ও চাঁদায় নিয়মিত ছিলেন এবং নিজ জীবদ্দশায় হিস্যায়ে জায়েদাদের সমস্ত অংশ পরিশোধ করে দেন। যখনই কোনো আয় হতো, তা থেকে সর্বপ্রথম চাঁদা দিতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। তাঁর সন্তানদেরও ধৈর্য ও মনোবল দিন। আর তাঁর যে সন্তান দেশের বাহিরে আছেন তাকেও আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্য ও মনোবল দান করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)